ভূমিকা

মানব সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকেই 'প্রাণ' কি এবং এর উৎপত্তি কোথা থেকে এই কৌতুহল মানুষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। জীব এবং জড়ের পার্থক্য এতোই প্রখর এবং বৈচিত্রময় যে এদের সীমানা নির্ধারণে কি নিয়ামক কাজ করেছে তা নিয়ে মানুষ মাথা ঘামিয়ে আসছে বহুদিন ধরে। তবে সাম্প্রতিক কিছু বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের ফলশ্রুতিতে বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকদের কাছে জীব এবং জড়ের সীমারেখা ক্রমশ বিলীন হয়ে যেতে শুরু করেছে বলেই মনে হচ্ছে। কিছু কিছু ভাইরাস, ভিরইডস, প্রিয়ন এবং কিছু পেপটাইডের শিকল জীব এবং জড়ের সীমারেখার মধ্যে এমনভাবে সেতুবন্ধন হিসাবে কাজ করে যে জীব এবং জড়ের মধ্যে পরিস্কার সীমারেখা টানা আসলেই দুস্কর হয়ে গেছে। এই অনুজীবগুলো কখনো মনে হয় জীবন্ত আবার কখনো মনে হয় পুরোপুরি জড়। প্রাণকে দীর্ঘকাল ধরেই 'রহস্যময় উপাদান' হিসাবে চিহ্নিত করে এসেছে বিজ্ঞানী, দার্শনিক সহ সাধারণ মানুষেরা। পৃথিবীতে কিভাবে প্রাণের সুত্রপাত হল তার পুরোপুরি রহস্য উন্মোচন এখন পর্যন্ত কেউই সঠিক ভাবে করতে পারেনি। এমনকি চার্লস ডারউইন ১৮৫৯ সালে লেখা যুগান্তকারী বই 'Origin of Species'- এ প্রাণের নান্দনিক বিকাশ ও এর বিবর্তনকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করলেও প্রাণের উৎস সম্পর্কে ছিলেন নিরব। ডারউইনের বক্তব্য ছিল, 'এর চেয়ে বরং পদার্থের উৎপত্তি নিয়ে ভাবা যেতে পারে।' বলাবাহুল্য, বিগত শতকের আশির দশকে স্ফীতি তত্ত্বের আবির্ভাবের পর থেকে পদার্থের উৎপত্তির রহস্য অনেকটাই সমাধান করে ফেলেছেন পদার্থবিজ্ঞানীরা। কিন্তু প্রাণের উৎপত্তি বিজ্ঞানীদের জন্য এখনও একটা বড় চ্যালেঞ্জ। এ জন্যই ডিএনএ যুগল সর্পিলের রহস্যভেদকারী নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ক্রিক তার 'Life itself: Its nature and origin' গ্রন্থে বলেন : 'সমস্ত প্রয়োজনীয় শর্তকে পরিতুষ্ট করে জীবনের উদ্ভব যেন প্রায় আলৌকিক ঘটনা'!

প্রাণ নিয়ে সবচেয়ে পুরাতন এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় বিশ্বাসী ধারণা হচ্ছে যে, ঈশ্বর বা অলৌকিক কোন সত্তা পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব ঘটিয়েছে। ইতিহাসের একটা বড় অংশ জুড়েই বিশ্বাস করা হয়েছে যে প্রাণ স্বর্গ থেকে এসেছে এবং ঈশ্বর মানুষসহ সব প্রাণীদেরকে বর্তমানরূপেই পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। প্লেটোর ভাববাদী দর্শনও শিখিয়েছে যে, প্রাণী বা উদ্ভিদ কেউ জীবিত নয়, কেবলমাত্র ঈশ্বর যখন প্রাণী বা উদ্ভিদ দেহে আত্মা প্রবেশ করান, তখনই তাতে জীবনের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়। প্লেটোর এই 'জীবনশক্তি তত্ত্ব' অ্যারিস্টটলের দর্শনের রূপ নিয়ে প্রায় দু'হাজার বছর মানব সভ্যতাকে শাসন করেছিল। পরবর্তীতে পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্মমত এই দর্শনকে 'মূল উপজীব্য' হিসেবে আত্মস্থ করে নেয়। তাই অধিকাংশ মানুষ আজও আত্মা দিয়ে জীবন-মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করার প্রাচীন প্রয়াস থেকে মুক্তি পায়নি। ধর্মবিশ্বাসীরা এবং বিশেষ করে আধুনিক 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন'-এর প্রবক্তাদের মতে প্রাণের উৎপত্তির কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থাকতে পারে না। ভাগ্য ভাল যে এই শ্রেনীর লোকজনদের কূপমুন্ডুক চিন্তাভাবনা বা বিশ্বাসনির্ভর 'তত্ত্ব'গুলোকে আজকের দিনের বিজ্ঞানীরা তেমন একটা আমলে নেন না। যেহেতু প্রাণের উৎপত্তির এই অতিন্দ্রীয় ধারণাকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ বা অপ্রমাণ কোনটাই করা যায় না, সেহেতু বিজ্ঞানীরা এই ধরণের ধারণাকে বৈজ্ঞানিক সীমারেখার বাইরেই রেখে দিতে বেশি পছন্দ করেন। আর তাছাড়া বিজ্ঞান অজ্ঞেয়বাদী নয়, খুব কঠোরভাবেই বস্তুবাদী। কাজেই বিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক ভাবেই প্রাণের উৎপত্তির রহস্যের সমাধান চান। বেশিরভাগই বিজ্ঞানীই মনে করেন এ পৃথিবীতেই নিষ্প্রাণ থেকে প্রাণের উৎপত্তি হয়েছে এবং তা কোন রহস্যজনক কারণে নয়, বরং জানা কিছু রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। তারা মনে করে থাকেন যে, সাড়ে তিনশ কোটি বছর আগে পৃথিবীর বিজারকীয় পরিবেশে অসংখ্য রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি ঘটেছে। জীবনের এই 'রাসায়নিক উৎপত্তি' তত্ত্ব নিয়ে এ বইয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বেশ কিছু সাম্প্রতিক গবেষণালব্ধ ফলাফল এতে

সন্নিবেশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় ধরনের মতবাদ অনুযায়ী মহাকাশ থেকে ধুমকেতু বা উল্কাপিন্ডের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ হতে পারে। অনেক বিজ্ঞানীই বর্তমানে এই ধারণার উপর তথ্য প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করছেন। আগে মনে করা হত মহাকাশের বিশাল দূরত্ব, তেজস্ক্রিয়তা, বায়ুশূন্যতা ইত্যাদি সামলিয়ে সুদূর বহির্বিশ্ব থেকে কোন অনুজীবের পৃথিবীতে এসে প্রাণের উন্মেষ ঘটানো স্রেফ অসম্ভব একটি ব্যাপার। কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু গবেষণালব্ধ ফলাফল এ সিদ্ধান্তের বিপক্ষে রায় দিয়েছে। ফলে প্যানস্পারমিয়া নামের 'বহির্বিশ্বে প্রাণের উৎপত্তি' তত্ত্বটি ইদানিংকালে অনেক বিজ্ঞানীদের কাছ থেকেই জোরালো সমর্থন পাচ্ছে। গত সপ্তদশ শতক থেকেই বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রাণের বিকাশের ধারণার ক্ষেত্রে বার বার বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। আর বিংশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং এই শতাব্দীতে প্রাণের উৎপত্তির প্রশ্ন এবং মহাবিশ্বে প্রাণের অস্তিত্বের সম্ভাবনা মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

আমাদের এ পৃথিবী ছাড়াও অন্য কোন গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা, কিংবা এর সম্ভাব্যতা কতটুক এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়ত এ বইটির আরেকটি আকর্ষনীয় দিক হিসেবে পাঠকদের সামনে চলে আসতে পারে। সমগ্র মহাবিশ্বে কোটি কোটি গ্রহ তারকারাজির মধ্যে পৃথিবীর অবস্থান যেন সাহারা মরুভূমিতে পড়ে থাকা একটি বালুকণার চেয়েও ক্ষুদ্র। শুধুমাত্র আমাদের আকাশগঙ্গা গ্যালাক্সিতেই নক্ষত্রের সংখ্যা চল্লিশ হাজার কোটি। আর এ ধরণের গ্যালাক্সির সংখ্যা পুরো মহাবিশ্বে কম করে হলেও অন্ততঃ একশ কোটি। আবার গ্যালাক্সিগুলোতে সূর্যের মত অনেক নক্ষত্রেরই আছে গ্রহমন্ডল। সুবিশাল এই মহাবিশ্বের অনন্ত নক্ষত্রমালার কোন কোন গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব থাকাটা তাই মোটেই অস্বাভাবিক নয়। মহাবিশ্বে বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণের অস্তিত্বের সম্ভাবণা কতটুকু, আমাদের এ সৌরজগতের মধ্যেই কোন গ্রহে প্রাণের উদ্ভবের উপযোগী পরিবেশ বিরাজ করছে কিনা, সৌরজগতের বাইরে মহাজাগতিক কাল্পনিক বন্ধুদের প্রতি আমরা মর্তবাসীরা এর মধ্যে কোন বার্তা পাঠিয়েছি কিনা, কিংবা মহাজাগতিক বুদ্ধিমত্তা আমাদের অস্তিত্বের প্রতি হুমকি কিনা এসমস্ত বিষয় নিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাণবন্ত আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। স্বভাবতই ড্রেক সমীকরণ, ফার্মির গোলকধাঁধা নিয়েও সচেতন ও অগ্রসর পাঠকদের জন্য বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা হয়ছে। বইটি পাঠকদের কিছুটা হলেও চিন্তার খোরাক যোগাবে বলে মনে করি।

যদিও প্রাণের উৎপত্তি এবং মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তা থাকার সম্ভাব্যতা নিয়ে অনেকেরই প্রচন্ড আগ্রহ রয়েছে তা সত্ত্বেও এ নিয়ে গবেষণা এবং লেখালেখি বাংলায় খুব বেশি হয়নি বললেই চলে। বিশেষ করে আমাদের জানা মতে বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় প্রাণের উৎপত্তি সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাযুক্ত বই একেবারেই অপ্রতুল। বাংলা ভাষাভাষি পাঠকদেরকে সাম্প্রতিক গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে প্রাণ এবং প্রাণের উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক ধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। বাংলায় যারা বিজ্ঞান বিষয়ক লেখালেখি করেন তাদের সকলেরই জানা আছে যে এটা কত ভয়ংকর কষ্টের। সঠিক পরিভাষা খুঁজে পাওয়ার জন্য মাথার চুল ছেঁড়েননি এমন বিজ্ঞান বিষয়ক লেখক বিরল। এ যে কি পরিমান ভোগান্তি তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানেন। আমরা পরিভাষার জন্য মূলতঃ 'বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান বিশ্বকোষ' এবং 'সংসদ বিজ্ঞান পরিভাষা'র সাহায্য নিয়েছি। তারপরও বহু জায়গায় আটকে যেতে হয়েছে। যেমন, Extremophile-এর কোন সঠিক বাংলা আমরা পাইনি, আমরা এর নামকরণ করেছি চরমজীবী। তেমনিভাবে Tube worm কে বলেছি নল কৃমি ইত্যাদি। Replication-এর বাংলা কখনও করা হয়েছে প্রতিরূপায়ন, কখনও বা অনুলিপি। একঘেয়েমি এড়ানোর জন্যই মূলতঃ এ ধরনের কৌশলের আশ্রয় নেয়া। অজনপ্রিয় এবং অপ্রচলিত বাংলা যথাসম্ভব এড়িয়ে যেতে আমরা সচেষ্ট থেকেছি। সেজন্যই এ

বইয়ে আমরা ‘Oxygen’কে ‘অক্সিজেন’ই রেখেছি, ‘অম্লজান’ বলিনি, কিংবা ‘Carbon dioxide’কে কার্বন ডাইঅক্সাইড রেখেছি, ‘অঙ্গার দ্বিঅম্লজ’ লিখিনি। এক্ষেত্রে সঠিক বাংলা প্রচলনের প্রচেষ্টার চেয়ে বরং ভাষার গতিশীলতা বজায় রাখাটাই আমাদের কাছে প্রাধাণ্য পেয়েছে বেশি।

এ বইটি সিরিজ আকারে মুক্তমনায় প্রকাশের সময় পাঠকদের কাছ থেকে আমরা অনেক সাড়া পেয়েছি। বহু পাঠক তাদের মূল্যবান মতামত দিয়ে বইটির মানোন্নয়নে সহায়তা করেছেন। বিশেষ করে মুক্তমনার একসময়কার সক্রিয় সদস্য (বর্তমানে ভিন্নমত ওয়েবসাইটের মডারেটর) ডঃ বিপ্লব পাল বইটির মানোন্নয়নের ব্যাপারে ব্যাপারে বেশ কিছু চমৎকার উপদেশ দিয়েছেন এবং আন্তর্জালে এর একটি সুন্দর পর্যালোচনা লিখেছেন। এ বইটি সিরিজ আকারে ডঃ সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত ত্রৈমাসিক নতুন দিগন্তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশের বিজ্ঞান সাময়িকী ‘সায়েন্স ওয়ার্ল্ডে’ও বেশ কিছু প্রবন্ধ পৃথকভাবে ছাপা হয়েছে। এদের সবার কাছেই আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পাঠকদের মতামত ছাড়াও আমাদের চেনা জানা অনেক জীববিজ্ঞানীদের সাথে বইটি নিয়ে আলোচনা করতে হয়েছে। তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক ডঃ ম. আখতারুজ্জামানের কথা আলাদা করে বলতেই হয়। তিনি যত্ন নিয়ে পান্ডুলিপিটি পড়ে মতামত ও পরামর্শ দিয়েছেন, জায়গায় জায়গায় বেশ কিছু সংশোধনও করেছেন। আর ধন্যবাদ জানাই বইয়ের প্রাকশক আলমগীর রহমানকে, যাঁর উৎসাহ আর আগ্রহ ব্যতীত এ বই প্রকাশ করা সম্ভব হত না। অবসর প্রকাশনীর জাকির আহমেদ বইটির কম্পিউটার কম্পোজের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ প্রাপ্য। আলমগীর রহমান এবং অবসর প্রকাশনীর সাথে প্রাথমিকভাবে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার জন্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের খ্যাতনামা অধ্যাপক শফি আহমেদকে ধন্যবাদ দিতেই হবে। তিনি শুধু প্রকাশকের সাথে আমাদের যোগাযোগ করিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হননি, সময় সময় পান্ডুলিপির ব্যাপারে খোঁজ-খবরও নিয়েছেন। মুক্তমনার উৎসাহী সদস্য শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অনন্ত বিজয় দাস এই বইটির প্রকাশনার ব্যাপারে শুধু আগ্রহ কিংবা উৎসাহই দেখাননি, প্রকাশক ও লেখকদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে বইটি সঠিক সময়ে প্রকাশের ব্যাপারে আমাদের সর্বাত্মক সাহায্য করেছে। তাকে আলাদা করে ধন্যবাদ না দিলে অন্যায় হবে, তা বলাই বাহুল্য।

আমাদের এই লেখা পড়ে বাংলাভাষি মাত্র একজন লোকও যদি, ছোটবেলা থেকে রক্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে সত্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন, তবে সেক্ষেত্রেই আমরা আমাদের কষ্টকে সার্থক বলে মনে করবো।

সকলের মঙ্গল কামনায়।

অভিজিৎ রায় (charbak_bd@yahoo.com)
ফরিদ আহমেদ (farid300@gmail.com)
মুক্তমনা (www.mukto-mona.com)
নভেম্বর ২০, ২০০৬

প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য...